গ্রামীণ অর্থনীতি : বরিশালের হিজলা উপজেলার মেমানিয়া ইউনিয়নের চিত্র

মোঃ শফিকুল ইসলাম

এই মাঠ গবেষণার মূল বিষয় ছিল বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতিতে পরিবর্তনের ধরন অনুসন্ধান করা। সেই পরিপ্রেক্ষিতে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের গ্রামীণ অর্থনীতির বিভিন্ন দিকের তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ থেকে কিছু বিষয় এই প্রবন্ধে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই অঞ্চলটি হল- বরিশাল জেলার হিজলা উপজেলার মেমানিয়া ইউনিয়ন। গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে ২০১৮ সালে।

মেমানিয়া মূলত একটি চর ইউনিয়ন, যেটা মেঘনা নদীর আশীর্বাদে মেঘনার বুকে জেগে উঠেছে। এই চরের উৎপত্তি সম্পর্কে কোন সঠিক ধারণা পাওয়া যায় না, তবে স্থানীয়দের মতে, স্বাধীনতাযুদ্ধের প্রাক্কালে মানুষ এই চরে বসবাস শুরু করে, যেটা ১৯৬৯ বা ১৯৭০-এর আশপাশে হবে। ইউনিয়নটিতে কোন সরকারি বিদ্যুৎ সংযোগ নেই।

১. পরিবহন ও যোগাযোগ

১.১ অভ্যন্তরীণ পরিবহন ব্যবস্থা

অভ্যন্তরীণ পরিবহন ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে মেমানিয়ায়। এই পরিবর্তনের সিংহভাগই হয়েছে বিগত ১০-১২ বছরে। অতীতে মানুষের পক্ষে পুরো ইউনিয়নে যাতায়াতের একমাত্র মাধ্যম ছিল হাঁটা। কিন্তু ২০০৫ থেকে ইউনিয়নে ভ্যান দিয়ে যাত্রী পরিবহন শুরু হয়। মাটির রাস্তা হওয়ায় এ ধরনের পরিবহন ভ্যানচালকের জন্য বেশ পরিশ্রমের ছিল, কিন্তু আয়ের জন্য এভাবেই যাত্রী পরিবহন চালিয়ে যায়। এরপর শ্যালো ইঞ্জিনের টেম্পো চালু হয় যাত্রী পরিবহনের জন্য। কিন্তু মাটির রাস্তা হওয়ায় এ ধরনের উচ্চগতির ভারী যানবাহনে অ্যাক্সিডেন্টের হার ছিল ব্যাপক। এমন অতিরিক্ত ক্ষয়ক্ষতির জন্য টেম্পো বেশিদিন এই ইউনিয়নে চলেনি। টেম্পোর মালিকরা অন্যান্য ইউনিয়নে চলে যায় বা তাদের টেম্পো বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়। ২০১৩-১৪ থেকে এই এলাকায় মোটরসাইকেলের চলাচল শুরু হয়। অনেকেই এই মোটরসাইকেল দিয়ে যাত্রী পরিবহন করে থাকে চরের মধ্যে। স্থানীয় বেকার যুবকদের মধ্যে এভাবে যাত্রী পরিবহন করে আয়ের ব্যাপারটি ব্যপক সাড়া পায়, অনেকেই ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে মোটরসাইকেল কিনে আয়ের পথ বেছে নিয়েছে। মোটরসাইকেল দিয়ে যাতায়াত বেশ দ্রুত হওয়ার দরুন পূর্বের এক-দেড় ঘণ্টার পথ এখন ১৫-২০ মিনিটে নেমে এসেছে। তবে দারিদ্র্যের হার বেশি থাকার কারণে এখনও অধিকাংশ মানুষ হেঁটে চলাচলকে প্রাধান্য দেয়।

১.২ যোগাযোগ

মেমানিয়ার পোস্ট কোড ৮২৬১। আসলে মেমানিয়ার পোস্ট কোড নেই, একটি উপডাকঘর ওসমান মঞ্জিলের অধীনে মেমানিয়ায় চিঠি ও অন্যান্য পার্সেল ডেলিভারি দেয়। উপডাকঘরটি স্থানীয় বাজারে অবস্থিত। গ্রামবাসীরা এখানেই তাদের চিঠি জমা দেন। প্রতি গ্রামবাসীকে গড়ে ৩-৪ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করতে হয় ডাকঘরে যেতে। ৮০.৭১ শতাংশ গ্রামবাসীর দাবি, এই ডাকঘর থেকে নিয়মিত চিঠি বিলি করা হয় না; এদের মধ্যে ২৬.৭৯ শতাংশের দাবি, তারা তাদের চিঠি কখনই এক সপ্তাহের আগে পাননি; বাকি ৭৩.২১ শতাংশ বলেছেন, ডাকঘর থেকে এক সপ্তাহের মধ্যেই চিঠি পেয়েছেন। যারা এক সপ্তাহের মধ্যে চিঠি পেয়েছেন গড়ে তাদের ৩.৬৩ দিন লেগেছে চিঠি পেতে। ডাক বিভাগের এই অবস্থা পূর্বের চেয়ে ভাল, একটা সময় এখানে চিঠি পৌঁছাতে ছয় মাসের মত সময় লাগত। এটা এই অঞ্চলের সরকারি যোগাযোগের অবস্থা।

সরকারি যোগাযোগের বাইরে গ্রামবাসী নানাভাবে এখন তাদের যোগাযোগ রক্ষা করেন। এর মধ্যে মোবাইল ফোন অন্যতম। এই অঞ্চলের মানুষ ২০০৭-০৮ থেকে মোবাইল ব্যবহার শুরু করেন। প্রথম দিকে মোবাইল বিলাসিতার চিহ্ন থাকলেও বর্তমানে এটা প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগে যারা ৩-৪ সপ্তাহের জন্য নদীতে মাছ ধরতে যেতেন, তাদের খবর পাওয়া যেত না, বর্তমানে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সেটা করা সম্ভব হচ্ছে; বিশেষত ঝড়ের সময়।

গবেষণায় দেখা গেছে, প্রায় ৯৬ শতাংশ পরিবারই মোবাইল ফোন ব্যবহার করে। বর্তমানে চায়নিজ মোবাইল ফোনগুলোর সস্তা দামের কারণে এত বিপুলসংখ্যক মানুষ এই অঞ্চলে মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে পারছে। এই ৯৬ শতাংশের মধ্যে ৪৭.৯২ শতাংশ পরিবারের একটি ফোন আছে, ২৬.৩৯ শতাংশ পরিবারের দুটি ফোন, ১০.৪২ শতাংশ পরিবারের তিনটি ফোন, ৭.৬৪ শতাংশ পরিবারের চারটি ফোন, ৩.৪৭ শতাংশ পরিবারের পাঁচটি ফোন এবং ৪.১৭ শতাংশ পরিবারের পাঁচটির বেশি ফোন রয়েছে।

২. মেমানিয়ার জনসংখ্যা

আদমশুমারি ২০১১ অনুযায়ী মেমানিয়ার জনসংখ্যা ছিল ৩০৬৮৬; জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৮১৮ জন। আদমশুমারি ২০০১ অনুযায়ী, এই অঞ্চলের জনসংখ্যা ছিল ২২৪৯২ এবং ২০০১-এর জনঘনত্ব ছিল প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৫৯৯.৪৭ জন।

২.১ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার

২০০১ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত ১০ বছরে জনসংখ্যা বেড়েছে ৮১৯৪ জন।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির গড় হার ৩.৬ শতাংশ। গবেষণা চলাকালে নতুন কোন আদমশুমারির তথ্য না থাকায় অতীতের গড় বৃদ্ধির হার (৩.৬

পেশা/বছর	২০১৮	১৯৮০-৯০
কৃষি	৫৯%	৭২.১৯%
সেবা	২.৮১%	১.১৮%
ব্যবসা	১৪.০৪%	৭.১০%
রাজনীতি	১.৬৯%	০%
জেলে	১৮.৫৪%	১৫.৯৮%
শিক্ষক	১.১২%	০.৫৯%
অন্যান্য	২.৮০%	২.৯৬%

শতাংশ) ধরে ২০১৮-এর জনসংখ্যার তুলনামূলক একটা আকার দেখানো হয়েছে। জনসংখ্যার গড় বৃদ্ধির হার ৩.৬ শতাংশ অনুযায়ী এ অঞ্চলের সাত হাজারের অধিক পরিবারে ২০১৮ সালে জনসংখ্যা ছিল ৩৯৩০৬ (প্রায়); এবং প্রতি পরিবারে গড়ে ৫ জন সদস্য রয়েছে।

২.২ পেশার সমীক্ষা

মেমানিয়ার কর্মজীবী মানুষের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ২২.৬৮ শতাংশ, যা প্রায় ৮৯১৫ জন। এই পেশার হার বিগত ৩০-৪০ বছরে ও বেশ পরিবর্তন হয়েছে।

উক্ত সমীক্ষা থেকে আমরা দেখতে পারছি, ২০১৮-তে এই অঞ্চলে কর্মজীবীদের প্রায় ৫৯ শতাংশ কৃষির সাথে যুক্ত ছিলেন; যেখানে ১৯৮০-৯০-এর দিকেও ৭২.১৯ শতাংশ কর্মজীবী মানুষ কৃষির সাথে যুক্ত ছিলেন। কৃষকের সংখ্যা কমে যাওয়ার পিছনে কয়েকটি কারণ থাকতে পারে–১. অন্য পেশার প্রতি আকর্ষণ বেড়েছে, ২. এ অঞ্চলের শিক্ষার হার বেড়েছে, এতে শিক্ষিত লোকজন কৃষিকাজ করতে আগ্রহী নন, ৩. কৃষি এখন আর হয়ত বা তেমন লাভজনক নয়–এমন নানাবিধ কারণেই কৃষকের হার কমে যেতে পারে। সেবা খাতে প্রবেশের অনুপাত বৃদ্ধি পেয়েছে, ব্যবসার প্রতি মানুষের আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে, বর্তমানে ১৪.০৪ শতাংশ পেশাজীবীই ব্যবসায়ী। বর্তমানে অনেকেই রাজনীতিকে পেশা হিসেবে নিচ্ছে, যেটা ৪০ বছর আগেও ছিল না। মৎস্যজীবীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, শিক্ষকের সংখ্যা বাড়লেও প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল।

৩. কৃষি

৩.১ কৃষিজ পণ্যের পরিবর্তন

বিগত ৩০ বছরে বিভিন্ন কৃষিপণ্যের চাষের অনুপাতে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। ধান চাষের হার বেড়েছে ৩৪.৭১ শতাংশ থেকে ৪০.৪২ শতাংশ; গম চাষ কমেছে ৭.৬৫ শতাংশ থেকে ২.০৯ শতাংশ; ভুট্টা ও কাউন চাষ কমেছে। মসলার ক্ষেত্রে মরিচ চাষ বেড়েছে ৯.৪১ শতাংশ থেকে ১১.১৫ শতাংশ; অন্যদিকে সরিষা, পিঁয়াজ ও রসুন চাষের হার কমেছে। সকল ধরনের সবজির চাষ কিছুটা বেড়েছে। বীজ জাতীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে সয়াবিনের চাষের হার অনেক বৃদ্ধি পেয়ে ৩.৫৩ শতাংশ থেকে ১৮.২৮ শতাংশ হয়েছে; মূলত বিস্কুট তৈরির কাঁচামাল হিসেবে সয়াবিনের ব্যাপক চাহিদা থাকায় এর চাষের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। তিল চাষের হার অনেক কমে গেছে। বিভিন্ন ধরনের ডাল চাষের হার কমেছে, কলাই চাষের হার বেড়েছে এবং তিসি চাষ একেবারেই বন্ধ হয়ে গেছে। মূলজাতীয় পণ্যের ক্ষেত্রে সবগুলোর চাষের হারই কিঞ্চিৎ কমেছে। আখ চাষের হার কমেছে, পূর্বে দেশের চিনিশিল্পের কাঁচামাল হিসেবে আখের ব্যাপক চাহিদা থাকলেও বর্তমানে খুঁড়িয়ে চলা চিনিশিল্পে তেমন একটা চাহিদা না থাকায় এর চাষের হার কমে গেছে। পানের চাষ ২০০০ সালের পর শুরু হয়েছে এবং খুব অল্প পরিমাণে পানের চাষ হয়। পূর্বে তামাকের চাষ হলেও বর্তমানে তামাক চাষ বন্ধ হয়ে গেছে। পাট চাষের হার ১০.৫৯ শতাংশ থেকে কমে ৮.০১ শতাংশ হয়েছে। ফল বাণিজ্যিকভাবে চাষ হচ্ছে খুব বেশিদিন হয়নি, তবে আস্তে আস্তে এর চাষের হার বাড়ছে। চর এলাকার মানুষের খেত থেকে ফল চুরির প্রবণতাও একটা বড় বাধা। অন্যান্য কৃষিপণ্যের আবাদ কিঞ্চিৎ বেড়েছে।

বীজ জাতীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে সয়াবিনের চাষের হার অনেক বৃদ্ধি পেয়ে ৩.৫৩ শতাংশ থেকে ১৮.২৮ শতাংশ হয়েছে; মূলত বিস্কুট তৈরির কাঁচামাল হিসেবে সয়াবিনের ব্যাপক চাহিদা থাকায় এর চাষের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। তিল চাষের হার অনেক কমে গেছে। বিভিন্ন ধরনের ডাল চাষের হার কমেছে, কলাই চাষের হার বেড়েছে এবং তিসি চাষ একেবারেই বন্ধ হয়ে গেছে। মূলজাতীয় পণ্যের ক্ষেত্রে সবগুলোর চাষের হারই কিঞ্চিৎ কমেছে। আখ চাষের হার কমেছে, পূর্বে দেশের চিনিশিল্পের কাঁচামাল হিসেবে আখের ব্যাপক চাহিদা থাকলেও বর্তমানে খুঁড়িয়ে চলা চিনিশিল্পে তেমন একটা চাহিদা না থাকায় এর চাষের হার কমে গেছে।

৩.২ কৃষিজমির পরিমাণ এবং উৎপাদনক্ষমতা

মোট কৃষিজমির পরিমাণের কোন তথ্য উপজেলা অফিসে নেই। কাজেই একটি জমি সমীক্ষার মাধ্যমে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ নির্ণয় করা হয়েছে। তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, মোট ভূমির ৭৩.৮ শতাংশ হচ্ছে কৃষিজমি, যার পরিমাণ প্রায় ৬৮৪২.৭৪ একর। বিগত ৩০ বছরে কৃষিজমির পরিমাণ বেড়েছে, যা আগে মোট জমির ৬৬.১৭ শতাংশ ছিল। চরের বাকি অংশ হয় গৃহস্থ বাড়ি অথবা পতিত জমি। কৃষিজমির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য; পূর্বের অনেক পতিত জমিই কৃষিভূমিতে পরিণত হয়েছে।

৩০ বছর আগে কৃষকরা প্রতি একর থেকে বছরে গড়ে ৮.২৪ মণ শস্য পেত, যা বর্তমানে বেড়ে একরপ্রতি ১১.১৮ মণে উন্নীত হয়েছে। কাজেই জমির উৎপাদনক্ষমতা প্রায় ৩৫.৬৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। [১ মণ=৪০ কেজি]

৩.৩ ধানের প্রজাতি

মেমানিয়াতে এই গবেষণা চলাকালে ৩৩ প্রজাতির ধানের নাম জানা গেছে। কিছু স্থানীয় ধানের প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে গেছে 'সবুজ বিপবের' শক্তিশালী দাপটের কারণে। সবুজ বিপ্লবের মূল ধারণা হচ্ছে, রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার। এই রাসায়নিক বস্তু জমিতে ব্যবহারের ফলে জমির রাসায়নিক ভারসাম্য কিছু স্থানীয় ধান প্রজাতির প্রতিকূলে চলে যায়, যার দরুন ওই সকল ধানের উৎপাদন কমে যায়। এই উৎপাদন কমার কারণে আস্তে আস্তে ওই ধানগুলোর চাষ বন্ধ হয়ে যায়, যা বর্তমানে মেমানিয়া থেকে বিলুপ্ত।

ক্রমিক	ধানের প্রজাতি	বর্তমানে উৎপাদন	৩০-৪০ বছর আগে উৎপাদিত হত	অবস্থা
১	ভুসিয়ারা	হা	হা	টিকে আছে
২	বিয়োজ		হা	বিলুপ্ত
৩	দুধকলম	হা		নতুন আবির্ভাব
৪	সূর্যমানিক		হা	বিলুপ্ত
৫	বটেশ্বরী		হা	বিলুপ্ত

৬	তেপুয়েল	হা		নতুন আবির্ভাব
৭	কালোজিরা	হা	হা	টিকে আছে
৮	জোয়ালি	হা	হা	টিকে আছে
৯	কালোগোড়া	হা	হা	টিকে আছে
১০	কালোহাইট্টা		হা	বিলুপ্ত
১১	কালামানিক	হা	হা	লড়ছে
১২	গড়িহাইট্টা		হা	বিলুপ্ত
১৩	গোপালজুড়ি		হা	বিলুপ্ত
১৪	কালামাদারী	হা		নতুন আবির্ভাব
১৫	পাংকাস	হা		নতুন আবির্ভাব
১৬	সাক্করপোড়া		হা	বিলুপ্ত
১৭	নল্লুপ	হা		নতুন আবির্ভাব
১৮	বহরী		হা	বিলুপ্ত
১৯	ইরি	হা		নতুন আবির্ভাব
২০	কটকতারা		হা	বিলুপ্ত
২১	ফুলবাদাম	হা		নতুন আবির্ভাব
২২	দিনাজপুরী		হা	বিলুপ্ত
২৩	কুমড়াগোজ	হা		নতুন আবির্ভাব
২৪	বিন্নিছড়ি		হা	বিলুপ্ত
২৫	লালচিকন	হা		নতুন আবির্ভাব
২৬	ভোজন ইরি	হা		নতুন আবির্ভাব
২৭	কাজল হাই	হা		নতুন আবির্ভাব
২৮	সাম্মন্ন		হা	বিলুপ্ত
২৯	পক্ষিরাজ	হা		নতুন আবির্ভাব
৩০	চাওলামগী	হা		নতুন আবির্ভাব
৩১	পাইনবাজল		হা	বিলুপ্ত
৩২	মরিচগুঁড়া	হা		নতুন আবির্ভাব
৩৩	চিনিগুঁড়া	হা		নতুন আবির্ভাব

তালিকায় দেয়া ৩৩ প্রজাতির ধানের মধ্যে ১৩টি স্থানীয় প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে গেছে বা এখন আর চাষ হচ্ছে না, কারণ হিসেবে চাষিদের থেকে কম উৎপাদনের বিষয়টি জানা গেছে। ৫ ধরনের স্থানীয় প্রজাতি এখনও চাষ হচ্ছে বা ধানবীজগুলো মাটির রাসায়নিক ভারসাম্যের সাথে অভিযোজিত হয়ে গিয়ে উৎপাদন একই রাখতে পেরেছে বা বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও নতুন ১৫টি ধান জাতের আবির্ভাব হয়েছে এই অঞ্চলে; উফশী বীজ হওয়ার দরুন এসব ধানবীজ বপনের চাহিদাও বেশি; এজন্য স্থানীয় কম ফলনশীল ধানবীজগুলোর জায়গা দখল করে নিয়েছে এমন উফশী ধানবীজগুলো।

নতুন উফশী বীজের ধান সম্পর্কে কৃষকদের অভিযোগ রয়েছে; উচ্চফলনশীল হলেও এসব ধানে নিয়মমাফিক কীটনাশক প্রয়োগ করতে হয় এবং নিয়মিত বিভিন্ন সার দিতে হয়, নতুবা এসব ধানে পোকা ধরে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে; এমনকি যে উচ্চ ফলনের জন্য এসব ধান জনপ্রিয়তা পায়, পর্যাপ্ত সার প্রয়োগ না করলে এসব ধানের উফশী গুণাগুণ তেমন একটা দেখাও যায় না। নিয়মিত সার ও কীটনাশক দিতে হয় বলে এসব ধান উৎপাদনে কৃষকদের উৎপাদন খরচও অনেক বৃদ্ধি পায়। এই বাড়তি উৎপাদন খরচ মেটাতে কৃষকদের অন্যের শরণাপন্ন হতে হচ্ছে, অধিকাংশ সময়ই তাদের কাছে পর্যাপ্ত টাকা থাকে না, কেননা দারিদ্র্যের হার এখানে এখনও ৯০ শতাংশের বেশি। টাকা ধার করার অন্যতম মাধ্যম জমি বা বাড়ি বন্ধক দেয়া; পরবর্তীতে উৎপাদিত ধান ন্যায্য মূল্যে বিক্রি করতে না পেরে জমি বা বাড়ি হারিয়ে সর্বস্বান্ত হওয়ার উদাহরণ নতুন নয় এ অঞ্চলে। তবে এখন ক্ষুদ্রঋণ চালু হওয়ায় বাড়ি বা জমি হারানোর হারের বেশ উন্নতি হয়েছে। অন্যদিকে স্থানীয় যেসব ধানের চাষ এখনও হচ্ছে, সেসব ধান চাষে কৃষকদের সার বা কীটনাশক তেমন একটা লাগে না বা একেবারেই লাগে না বললেও ভুল হবে না। সাধারণত খুব প্রয়োজন ছাড়া স্থানীয় প্রজাতির ধান চাষে কোন রাসায়নিক সার বা কীটনাশক ব্যবহার করা হয় না। এসব ধানের উৎপাদন খরচ উফশী বীজ থেকে বহুলাংশে কম। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য, এসব ধানবীজ এখন বীজ মার্কেটে পাওয়া যায় না, কেবলমাত্র যারা পারিবারিকভাবে এসব বীজ সংরক্ষিত রেখেছে, তারাই এর চাষ করছে নিজেদের প্রয়োজনে; অথবা বীজের জন্য অতিরিক্ত খরচ করতে চায় না এজন্যই বাড়িতে থাকা বীজ দিয়ে ধান চাষ চালিয়ে যাচ্ছে।

৩.৪ মৎস্য

মেমানিয়া একটি চর ইউনিয়ন, এর চারপাশ মেঘনা নদী দিয়ে ঘেরা। এই অঞ্চলের মাছের প্রধান উৎস হচ্ছে মেঘনা নদী। ইউনিয়নের কর্মজীবী মানুষের ১৮.৫৪ শতাংশ সরাসরি জেলে পেশার সাথে সম্পৃক্ত, যার সংখ্যা প্রায় ১৭০০ জন। তবে পরিবারের খাদ্যের চাহিদা মেটানোর জন্য অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে মাছ ধরে থাকে, বাণিজ্যিক মৎস্যজীবীদের তালিকায় তাদের নাম বা সংখ্যা আসে না। একটা সময় নদী থেকে সরাসরি মাছ ধরে খাওয়াতেই মানুষের বেশি আগ্রহ ছিল, তবে এখন অনেকেই স্থানীয় বাজার থেকে মাছ কিনে পরিবারের আমিষের চাহিদা মেটাচ্ছে।

৩.৫ যেসব মাছ পাওয়া যায়

এই অঞ্চলে সাধারণত দুই ধরনের মাছ পাওয়া যায়–১. প্রাকৃতিক মাছ, ২. চাষের মাছ। একটা সময় প্রাকৃতিকভাবে পাওয়া মাছই মেমানিয়ার একমাত্র আমিষের উৎস ছিল। তবে নদীতে মাছের জোগান কমে আসায় দাম বৃদ্ধি পেতে শুরু করে, দারিদ্র্যপ্রবণ এ অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষেরই ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যায় প্রাকৃতিক উৎসের মাছ।

অন্যদিকে মৎস্যজীবীরা বেশি দামের আশায় তাদের ধরা মাছের সিংহভাগই ঢাকায় পাঠিয়ে দেন বা বিদেশে পাঠানোর জন্য বিক্রি করে দেন। আবার চাষকৃত মাছের দাম কম হওয়ায় চাহিদা বেশ ভালই দেখা যায়। ২০০৫-০৬-এ ইউনিয়নের দু-একজন বাণিজ্যিকভাবে মাছ চাষ শুরু করেন, চাহিদা বাড়ার কারণে বর্তমানে অনেকেই মাছ চাষের দিকে ঝুঁকছেন।

প্রাকৃতিক মাছ : ইলিশ, বোয়াল, চিংড়ি, পোয়া, মাগুর, আইড়, বাইলা, চিতল, পাবদা, পুঁটি, শোল, কই, নানচিল কোরাল, টাকি, ভেটকি, বাটা, পারসে, পাঙ্গাশ, সরপুঁটি, গুলশা, মৃগেল, টেংরা, গজার, মলা, রিটা, বাগাইড়, গাংমাগুর, খলশে, শিং, সিলভার কার্প, রুই, কাতলা এবং আরও কয়েক ধরনের ছোট মাছ।

চাষের মাছ : রুই, কাতলা, শিং, বিদেশি মাগুর, পাঙ্গাশ, গ্রাসকার্প, তেলাপিয়া, নাইলোটিকা, কই।

৩.৬ মাছের প্রাপ্যতা

মৎস্যজীবীদের প্রধান পেশা মূলত ইলিশ শিকার। যে সকল জেলে ৩০-৪০ বছর ধরে মাছ শিকারের সাথে যুক্ত আছেন, তাদের মতে মেঘনায় মাছের প্রাপ্যতা অনেক কমে গেছে। তাদের মতে, ৩০-৩৫ বছর আগেও তারা দৈনিক ১৫০-২০০ হালি ইলিশ পেতেন; সেসব ইলিশের প্রতিটির ওজন গড়ে মোটামুটি আড়াই-তিন কেজি ছিল; তারা তাদের ধৃত মাছ 'পণ'-এ হিসাব করতেন [১ পণ=৮০ পিস]। কিন্তু বর্তমানে দৈনিক ২-৩ হালি ইলিশ পান মৎস্যজীবীরা; ভরা মৌসুমে ৪ থেকে ১২ হালি পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়; তবে মাঝে মাঝে মাত্র ৪-৬টি ইলিশ নিয়েও ফিরতে হয় তাদের। বর্তমানে নদীতে দেড় কেজির ইলিশ পাওয়া দিবাস্বপ্নের মতই। অন্যান্য মাছের মধ্যে বোয়াল, আইড়, নদীর পাঙ্গাশ, মাগুর, চিতল, বাগাইড়, রুই, কাতলা ইত্যাদি মাছ ইলিশের উপজাত হিসেবে ধরা পড়ে বললেও ভুল হবে না। কেননা মৎস্যজীবীরা মূলত ইলিশ শিকারের জন্যই নদীতে যান, চিংড়ি ব্যতীত অন্য কোন মাছ শিকারের জন্য এককভাবে নদীতে নামেন না।

> ৬৭টি পরিবারের ওপর চালানো গবেষণায় মোট ৪৮৫ জন অংশগ্রহণ করে; এর মধ্যে ১৪৪ জন নিজেদের নাম-ঠিকানা লিখতে ও পড়তে পেরেছে; অর্থাৎ শিক্ষিতের হার ২৯.৬৯ শতাংশে দাঁড়ায়।

৩.৭ মৎস্যজীবীদের মতে ইলিশের পরিমাণ কমার কারণ : এর উত্তরে প্রবীণ মৎস্যজীবীরা বলছেন, ৩০-৪০ বছর আগে কারেন্ট জালের কোন অস্তিত্বই ছিল না। তাঁরা তখন 'কট-ববিন' (সুতার জাল) জাল দিয়ে ইলিশ শিকার করতেন। এই কট-ববিন জালের প্রধান বিশেষত্ব হচ্ছে, জালের মধ্যবর্তী ফাঁকার পরিমাণ ৫ ইঞ্চি বাহুর বর্গের সমান; এতে ছোট ছোট মাছ সহজেই এই জাল গলে বেরিয়ে যেতে পারত। এতে বাচ্চা ইলিশ বড় হওয়ার সুযোগ পেত। বর্তমানে কারেন্ট জালের ব্যাপক ব্যবহারের কারণে ৫-৬ ইঞ্চির ইলিশও ধরা পড়ে যায়, ইলিশ বড় হওয়ার কোন সুযোগই পায় না। তাছাড়া বাচ্চা ইলিশ কারেন্ট জালে আটকানোর সাথে সাথেই মারা যায়, জাল তুলে বাচ্চা ইলিশ নদীতে পুনরায় ছেড়ে দেয়ারও সুযোগ নেই। বর্তমানে যুবক শ্রেণির মৎস্যজীবীরা কারেন্ট জাল ব্যতীত অন্য কোন জাল ব্যবহারে আগ্রহী না; প্রবীণ জেলেরা সুতার জাল ব্যবহার করতে চাইলেও তাঁরা সেটা করতে পারছেন না, কেননা সুতার জালে মাছ কম ধরা পড়বে এবং অন্য জেলে থেকে আয় কম হবে; তবে প্রবীণ জেলেদের দাবি–সরকারের কঠোর নিয়ন্ত্রণে যদি কারেন্ট জাল বন্ধ করা যায়, তাহলে দেশে আবারও বড় ইলিশ পাওয়া যাবে।

৪. মেমানিয়ার শিক্ষা

৪.১ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা

মেমানিয়াতে ১০টি স্কুল (৮টি প্রাইমারি এবং ২টি হাই স্কুল) এবং ২টি মাদরাসা রয়েছে; এলাকায় কোন কলেজ নেই।

৪.২ শিক্ষার্থীর সংখ্যা

মেমানিয়াতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ১০.৩৩ শতাংশ, কাজেই শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৪০৬০। ৬টি বড় স্কুল থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। বাকি ৪টি স্কুলের শিক্ষার্থীর সংখ্যা খুব বেশি নয়। তালিকায় প্রদত্ত ৬টি স্কুলের শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২৮৩১, বাকি ৪টি স্কুলে ১২২৯ জনের মত শিক্ষার্থী রয়েছে। মোট জংসংখ্যার ১ শতাংশ বা এর কম উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে পড়াশোনা করে। যেহেতু এলাকায় কলেজ নেই, তাই চরের বাইরে গিয়ে কলেজে ভর্তি হতে অনেকেই চায় না, অধিকাংশ শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবনই দশম শ্রেণিতে সমাপ্ত হয়ে যায়।

৪.৩ পাবলিক পরীক্ষায় অবদান

যেহেতু কলেজ নেই, কাজেই এ অঞ্চলের শিক্ষার্থীরা শুধুমাত্র পিইসি, জেএসসি ও এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারে।

তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে, ৪টি স্কুল থেকে মোট ৪২১ জন পিইসি-২০১৭ এবং এসএসসি-২০১৮-তে অংশগ্রহণ করেছে, যার মধ্যে ১৭৯ জন পিইসিতে এবং ২৪২ জন এসএসসিতে। এই ৪টি স্কুলের পাসের হার পিইসিতে ৮৭.১৫ শতাংশ এবং এসএসসিতে ৫৭.০২ শতাংশ। এসএসসির পাসের হার মোটেও সন্তোষজনক নয়, তবে হয়ত বা এটা ঠিকই আছে চর হিসেবে। এই অঞ্চলের শিক্ষার শুরু থেকে এ পর্যন্ত মোট হাতে গোনা ১০-১২টি এ+ এসেছে, সেই সংখ্যাটাও ১০০ ছাড়ায়নি।

শিক্ষার্থীদের এমন দুর্বল ফলের জন্য দায়ী দুর্বল সহায়তা। স্কুলের শিক্ষকদের যোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ, তার ওপর শিক্ষক সংকট রয়েছে প্রতিটি স্কুলেই। মোটামুটি ৫-৬ জন শিক্ষক দিয়েই একেকটি স্কুল চালিত হচ্ছে। এজন্য শিক্ষার মানও তেমন শক্তিশালী নয়। আরেকটি কারণ হিসেবে বলা যায়, ইউনিয়নবাসীর মানসিকতা। এখনও অনেক মা-বাবা মনে করেন, পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করাই যথেষ্ট। এজন্য মোটামুটিভাবে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত গাইড দিলেও এরপর আর তেমন কোন গাইড দেয়া হয় না শিক্ষার্থীদের। সাধারণত মেমানিয়ায় একটি ছেলে বা মেয়ে যখন নবম-দশম শ্রেণিতে ওঠে, তখন তার বয়স ১৮-২০ বছর হয়ে যায়; আর এমন বয়সের একটি ছেলে/মেয়ের জন্য পড়াশোনার চেয়ে রোজগার বা ঘরের কাজে সহায়তা করার বিকল্প বের করা দুরূহ এই অঞ্চলের মানুষের জন্য। এজন্যই মূলত পিইসিতে মোটামুটি ভাল পাসের হার থাকলেও এসএসসিতে সেটায় ব্যাপক ধস নামে।

৪.৪ লিঙ্গভিত্তিক শিক্ষার্থী

৩০-৪০ বছর আগেও এই অঞ্চলে মেয়েরা ঘরের বাইরে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারত না; তখন মেয়েদের ঘরেই বা বাড়ির পাশের মক্তবে কুরআন শিক্ষাই ছিল একমাত্র শিক্ষা। কিন্তু এখন অবস্থার বদল

হয়েছে, এখন প্রায় মা-বাবাই চান তাঁদের মেয়েসন্তানকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াতে। নিচে ভাড়াইয়া প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষার্থীসংখ্যার তালিকা দেয়া হল।

ভাড়াইয়া প্রাইমারি স্কুলে ৪৯৬ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে মেয়ে শিক্ষার্থীর ২৯১ জন ৫টি ক্লাসে। ছেলে শিক্ষার্থীর হার ৪১.৩৩ শতাংশ এবং মেয়ে শিক্ষার্থীর হার ৫৮.৬৭ শতাংশ। স্পষ্টভাবেই মেয়ে শিক্ষার্থীর হার ছেলে শিক্ষার্থী থেকে বেশি। একই চিত্র দেখা গেছে দক্ষিণ চর মেমানিয়া প্রাইমারি স্কুলে এবং অন্য প্রাইমারি স্কুলগুলোতেও। প্রাইমারি স্তর পর্যন্ত মেয়েদের পরিবার ছেলেদের পরিবার থেকে তাদের সন্তানকে স্কুলে পাঠাতে বেশি আগ্রহী।

হাই স্কুলগুলোতে লিঙ্গভিত্তিক তথ্য চাওয়া হলেও তারা সেটা দেখাতে ব্যর্থ হয়। তাই সমীক্ষার মধ্যে ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীর হার বের করে নেয়া হয়েছে। তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে, হাই স্কুলে মেয়েদের থেকে ছেলেদের হার বেশি, অর্থাৎ প্রাইমারি স্তরে যে হারে মেয়ে শিক্ষার্থী ছিল, তার অধিকাংশই হাই স্কুলে আসতে পারেনি বা ঝরে গেছে। তবে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর তালিকায় ছেলেরাও রয়েছে এবং সংখ্যাটা বেশ বড়। সাধারণত হাই স্কুলে উঠে গেলে মেয়েদেরকে বিয়ে দিয়ে দেয়া হয় অথবা পরিবার থেকেই পড়াশোনা বন্ধ করে দেয়া হয় নিরাপত্তার কথা ভেবে। অনেক মেয়ের পরিবারই মনে করে, স্কুলে ছেলেদের সাথে মিশলে পরে মেয়ের বিয়ে দিতে সমস্যা হবে। তাছাড়া যে সকল মেয়ে এসএসসি শেষ করতে পারে, তাদের অনেকেই আবার কলেজ অবধি যেতে পারে না ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও; যেহেতু কলেজ চরের বাইরে, সেজন্য নিরাপত্তার কথা ভেবেও অনেক মেয়ে কলেজে ভর্তি হয় না।

ছেলেদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা আয়ের। গ্রাম এলাকায় সাধারণত ১৫-২০ বছরের ছেলেদের পরিবারের আয়ের মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। পড়াশোনার চেয়ে মাছ ধরার নৌকায় কাজ করলে ভাল আয় করতে পারে, অথবা খেতে কাজ করাটাও শ্রমিকের খরচ কমায়–এমন নানা কারণে ছেলেদের সিংহভাগই ঝরে যায়, এদের এসএসসি পরীক্ষায় বসা হয় না।

৪.৫ মেমানিয়ার শিক্ষিতের হার

সরকারিভাবে ২০১১-এর আদমশুমারি অনুযায়ী ৩৭ শতাংশ বলা হয়েছে। কিন্তু চরের মানুষের বর্তমান শিক্ষার অবস্থা ৩৭ শতাংশ নির্দেশ করে না। এজন্য একটি সমীক্ষা করা হয়েছে শিক্ষার হার বের করার জন্য, যেখানে শুধু তাদের নাম-ঠিকানা লিখতে ও পড়তে বলা হয়েছে। ৬৭টি পরিবারের ওপর চালানো গবেষণায় মোট ৪৮৫ জন অংশগ্রহণ করে; এর মধ্যে ১৪৪ জন নিজেদের নাম-ঠিকানা লিখতে ও পড়তে পেরেছে; অর্থাৎ শিক্ষিতের হার ২৯.৬৯ শতাংশে দাঁড়ায়। যদিও নাম-ঠিকানা পড়তে ও লিখতে পারা ২০০১ আদমশুমারির মানদণ্ড, সেই ২০০১-এর মানদণ্ডের হিসাবেও এ অঞ্চলের শিক্ষার হার ৩০ শতাংশ পার করেনি ২০১৮ সালে। ২০১৮-তে করা গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল থেকেও ২০০১-এর সরকারি তথ্য অনুযায়ী এই অঞ্চলের শিক্ষার হার বেশি দেখা যাচ্ছে। এটা অনেকভাবেই হতে পারে। সরকারিভাবে প্রাপ্ত ডাটায় ভুল থাকতে পারে, যেমন গ্রামের অনেক মানুষ সম্মান বাঁচাতে নিজেই পঞ্চম শ্রেণি পাস দাবি করেন।

৫. মেমানিয়ার স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাব্যবস্থা

মেমানিয়ার স্বাস্থ্য ও সেবা খাত এখনও অনেক দুর্বল, কিছু ক্ষেত্রে উন্নয়নের ছাপ পাওয়া গেলেও তা অপ্রতুল।

৫.১ সাধারণ রোগবালাই এবং বিশেষণ

মেমানিয়ার স্বাস্থ্য খাত নিয়ে গবেষণার সময় চেষ্টা করা হয়েছে এ অঞ্চলের বিগত ৪০ বছরের রোগ সংক্রমণে কেমন পরিবর্তন হয়েছে তা পর্যবেক্ষণের। প্রায় ৩৭ ধরনের রোগের উপস্থিতি পাওয়া গেছে এই অঞ্চলে। রোগগুলোর একটি তালিকা নিচে দেয়া হল :

ক্রম	রোগের নাম	২০১৮-তে সংক্রমণ, জনসংখ্যার শতাংশ	১৯৮০ বা পূর্বের সংক্রমণ, জনসংখ্যার শতাংশ	বর্তমান অবস্থা
১	জ্বর	২৭.৪৮	১৩.২৩	অতিরিক্ত বেড়েছে
২	জন্ডিস	৩.১২	২.৩৮	বেড়েছে
৩	হাম	১.১৩	২.৬৫	কমেছে
৪	বসন্ত	০.৮৫	৫.৫৬	কমেছে
৫	সর্দি	৯.৬৩	৫.৫৬	বেড়েছে
৬	মাথা ব্যথা	৭.৬৫	২.৩৮	বেড়েছে
৭	ডায়াবেটিস	১.৭	০.৫৩	বেড়েছে
৮	ডায়রিয়া	৬.২৩	২০.৬৩	অনেক কমেছে
৯	পেট ব্যথা ও বদহজম	৪.২৫	১.৫৯	বেড়েছে
১০	গ্যাস্ট্রিক	২.২৭	১.৫৯	বেড়েছে
১১	চোখের সমস্যা	০.৫৭	০.৫৩	বেড়েছে
১২	হেপাটাইটিস	০.৫৭	০	নতুন
১৩	চিকুনগুনিয়া	১.১৩	০	নতুন
১৪	যক্ষ্মা	২.২৭	২.৬৫	কমেছে
১৫	টাইফয়েড	৩.১২	২.১২	বেড়েছে
১৬	কলেরা	৪.৫৩	১৩.৭৬	অনেক কমেছে
১৭	চর্মরোগ	১.১৩	০.৭৯	বেড়েছে
১৮	নিউমোনিয়া	১.৪২	০.৫৩	বেড়েছে
১৯	অ্যাপেন্ডিক্স	০.২৮	০	নতুন
২০	আমাশয়	১.৯৮	১০.০৫	অনেক কমেছে
২১	গলগণ্ড	০.৮৫	০	নতুন
২২	বাত	১.১৩	০.৫৩	বেড়েছে
২৩	ক্যান্সার	১.৪২	০.৫৩	বেড়েছে
২৪	নাকের সমস্যা	০.২৮	০	অজানা
২৫	কাশি	১০.৪৮	৭.৪১	বেড়েছে

২৬	অপুষ্টিতে ভোগা	০.২৮	০	অজানা
২৭	হাড়ক্ষয়	০.২৮	০	নতুন
২৮	কিডনি সমস্যা	০.৫৭	০	নতুন
২৯	রক্তশূন্যতা	০.৮৫	০	অজানা
৩০	টনসিল	০.২৮	০	অজানা
৩১	হাঁপানি	০.৮৫	২.৯১	কমেছে
৩২	অর্থোপেডিক্স সমস্যা	০.৮৫	০.২৬	বেড়েছে
৩৩	চুলকানি	০.২৮	০	অজানা
৩৪	ম্যালেরিয়া	০.২৮	০.৭৯	কমেছে
৩৫	ইনফ্লুয়েঞ্জা	০	০.২৬	বিলুপ্ত
৩৬	কৃমি সংক্রমণ	০	০.৫৩	বিলুপ্ত
৩৭	পোলিও	০	০.৫৩	বিলুপ্ত

তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে, এই অঞ্চলে জ্বরে আক্রান্তের হার ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। জ্বরের এই ব্যাপক আক্রান্তের হার নির্দেশ করে স্থানীয়দের শারীরিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমেছে। জন্ডিস, সর্দি, মাথা ব্যথা, ডায়াবেটিস, পেটের সমস্যা, গ্যাস্ট্রিক, চোখের সমস্যা, টাইফয়েড, চর্মরোগ, নিউমোনিয়া, বাত, ক্যান্সার, কাশি, হাড়ের সমস্যা–এই রোগগুলো পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। জন্ডিস, টাইফয়েড, চর্মরোগে আক্রান্তের হার বৃদ্ধি নির্দেশ করে খাবার এবং ব্যবহারের পানি দূষণ পূর্বের তুলনায় বেড়েছে। মাথা ব্যথা, চোখের সমস্যার হার বেড়েছে; এই অঞ্চলের মানুষের মোবাইল ফোন ব্যবহার বেড়েছে এবং অতিরিক্ত সময় মোবাইল ফোনে দেয়ার কারণেই মাথা ব্যথা এবং চোখের সমস্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ঘন ঘন সর্দিতে আক্রান্ত হওয়াও শারীরিক প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাসের ইঙ্গিত দেয়। পেটের সমস্যা ও গ্যাস্ট্রিকের হার পূর্বের তুলনায় বেড়েছে, কারণ স্থানীয়দের বাজারের হোটেলে খাওয়ার হার বৃদ্ধি পেয়েছে; হোটেলগুলোতে পোড়া তেল ও বাসি খাবার সরবরাহের কারণেই এমন সমস্যার হার বেড়েছে বলে ধারণা করা যায়। ক্যান্সারের হার বেড়েছে পূর্বের তুলনায়। বর্তমানে এই অঞ্চলের কৃষিজ দ্রব্যে অধিকাংশেই রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার হচ্ছে; তাছাড়া বর্তমানে মানুষের খাদ্যতালিকায় বড় অংশ জুড়ে রয়েছে পোল্ট্রি মুরগি ও চাষের মাছ। বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে চাষ করা এসব মাছ ও মুরগির খাবারে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি ভারী ধাতু ক্রোমিয়াম থাকে। এসব খাদ্যের মাধ্যমে মানবদেহে প্রবেশ করছে; ফলাফল হিসেবে ক্যান্সারে আক্রান্তের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। হাড়ের সমস্যা বৃদ্ধি অপুষ্টি নির্দেশ করে।

হাম, বসন্ত, যক্ষ্মা, হাঁপানি, ম্যালেরিয়া–এসব রোগে আক্রান্তের হার কমেছে পূর্বের তুলনায়। হাম, বসন্ত, যক্ষ্মা পূর্বে মারণব্যাধি থাকলেও বর্তমানে এসব রোগ মারণব্যাধি হিসেবে চিহ্নিত হয় না। হাঁপানিতেও আক্রান্তের হার কমেছে। গ্রীষ্মকালীন আবহাওয়ার অঞ্চল হিসেবে বাংলাদেশও ম্যালেরিয়ার রেড জোন হিসেবে বৈশ্বিকভাবে চিহ্নিত ছিল, তবে বাংলাদেশের সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের কার্যকলাপে ম্যালেরিয়া মেমানিয়া তথা পুরো বাংলাদেশেই ভয়াবহ পর্যায় থেকে বেরিয়ে গেছে।

এছাড়াও ডায়রিয়া, কলেরা, আমাশয়–এই তিন রোগকে পূর্বে মারণব্যাধি হিসেবে সরকারিভাবে চিহ্নিত করা হলেও বর্তমানে এসব রোগ ব্যাপকভাবে প্রতিকার করা সম্ভব হয়েছে। মূলত দূষিত পানি এবং অপরিষ্কার জীবনযাপনের জন্য এসব রোগে ব্যাপক হারে আক্রান্ত হত মানুষ। তাছাড়া খাবার স্যালাইন সম্পর্কে ধারণা না থাকায় বাংলাদেশে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে এসব রোগে প্রাণহানি হত। তবে মানুষজনের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং স্থানীয় বাজারে পর্যাপ্ত ওষুধ পাওয়া যায় বিধায় এখন আর এসব রোগে মানুষের প্রাণহানি হয় না পূর্বের মত। তাছাড়া পরিচ্ছন্ন জীবনযাপনের জন্য এসব রোগে আক্রান্তের হারও কমেছে অনেক।

ইনফ্লুয়েঞ্জা, কৃমি সংক্রমণ, পোলিও–রোগগুলোতে পূর্বে মানুষের আক্রান্তের খবর পাওয়া গেলেও এই গবেষণা চলাকালে আক্রান্তের কোন সংবাদ বা তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে স্থানীয়দের স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং খাওয়ার আগে হাত ধুয়ে নেয়ার মানসিকতার জন্য কৃমি সংক্রমণ শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে।

এই অঞ্চলে নতুন কিছু রোগের আবির্ভাবের তথ্য পাওয়া গেছে। রোগগুলো হল হেপাটাইটিস, চিকুনগুনিয়া, অ্যাপেন্ডিক্স, গলগণ্ড, হাড়ক্ষয়, কিডনি সমস্যা। কিডনি সমস্যা বৃদ্ধির কারণ এবং ওপরে বর্ণিত ক্যান্সারের কারণ একই বলে ধারণা করা হচ্ছে। খাদ্যে বিষের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়াতেই বর্তমানে মানুষ কিডনি রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। গলগণ্ড রোগ সাধারণত হয়ে থাকে আয়োডিনের অভাবে। খাদ্য লবণ থেকেই আয়োডিনের জোগান আমরা পেয়ে থাকি, তবে খাদ্য লবণে যদি আয়োডিনের ঘাটতি থেকে সেক্ষেত্রে মানুষের আয়োডিনশূন্যতার বিভিন্ন রোগে আক্রান্তের হার বৃদ্ধি পাবে। অতীতে গলগণ্ড রোগীর তথ্য পাওয়া না গেলেও বর্তমানে পাওয়া গেছে, এটা নির্দেশ করে স্থানীয়দের ব্যবহার্য খাদ্য লবণে যথেষ্ট পরিমাণে আয়োডিনের ঘাটতি রয়েছে। হাড়ক্ষয় সাধারণত বয়স্কদের একটি সাধারণ রোগ, পর্যাপ্ত পুষ্টির অভাবে হাড়ক্ষয় হয়ে থাকে; তবে অতীতে এর অস্তিত্ব পাওয়া না গেলেও বর্তমানে এমন রোগী পাওয়া যাচ্ছে। চিকুনগুনিয়ায় আক্রান্ত রোগী পাওয়া গেছে এই অঞ্চলে। রোগটি নতুন বাংলাদেশে, চিকিৎসা না থাকলেও চিকিৎসকরা জ্বরের ওষুধ এবং বিশ্রামের পরামর্শ দিয়ে থাকেন। তবে মশা নিধনের কোন ব্যবস্থা না থাকা এবং বাড়ির আশপাশে ঝোপঝাড়ের আধিক্য এর অন্যতম কারণ। হেপাটাইটিস রোগী পাওয়া গেছে এই অঞ্চলে। পূর্বে এমন রোগী না থাকলেও বর্তমানে এমন রোগী পাওয়া যাচ্ছে। প্রাথমিকভাবে এই রোগ পর্যাপ্ত চিকিৎসার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণে আনা গেলেও রোগ অতিরিক্ত বেড়ে গেলে লিভার সিরোসিস বা লিভার ক্যান্সারে রূপ নিতে পারে। লিভার ক্যান্সার ও লিভার সিরোসিসে চিকিৎসকরা লিভার প্রতিস্থাপনের পরামর্শ দিলেও তার খরচ কোটির ওপরে, যা মেমানিয়ার মানুষের সাধ্যের বাইরে। এছাড়াও অনেক মানুষ অ্যাপেন্ডিজ্কে সমস্যায় আক্রান্ত হচ্ছে, যেটা পূর্বে ছিল না।

নাকের সমস্যা, অপুষ্টি, রক্তশূন্যতা, টনসিল, চুলকানি–এই সমস্যাগুলোর বর্তমান তথ্য পাওয়া গেলেও অতীতে এসব রোগে আক্রান্তের হার সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি, তাই এসব রোগের বর্তমান অবস্থা 'অজানা' হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

৫.২ চিকিৎসা ব্যবস্থা

মেমানিয়ার চিকিৎসাব্যবস্থা খুব দুর্বল। এই ইউনিয়নে কোন স্বাস্থ্য

কমপ্লেক্স বা হাসপাতাল নেই। সাধারণত মানুষ বাজারের ফার্মেসির মেডিক্যাল ট্রেনিং নেয়া লোক থেকে চিকিৎসা নেয় অথবা কবিরাজ থেকে চিকিৎসা নেয়। ফার্মেসির মেডিক্যাল ট্রেনিং নেয়া লোকজনের দাবি, তারা জ্বর, সর্দি, গ্যাস্ট্রিক, ডায়রিয়ার মত সাধারণ রোগের ওষুধ দিয়ে থাকে; কিন্তু জটিল রোগের চিকিৎসার জন্য তারা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে বা বরিশাল শহরে নিতে পরামর্শ দেয়; যদিও বাস্তবতা হল এসব লোকজন বিভিন্ন জটিল রোগের চিকিৎসা করার চেষ্টা চালায় এবং নিজেদের ডাক্তার বলে দাবি করে। ইউনিয়নবাসীদের প্রথম ভরসা তারাই। যে কোন রোগের জন্যই অ্যান্টিবায়োটিক প্রদান এবং ঘুমের ওষুধ প্রদান করে থাকে তারা; যদিও অ্যান্টিবায়োটিক বা ঘুমের ওষুধের মাত্রা সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই তাদের। গবেষণা চলাকালে একজনের মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া গেছে অতিরিক্ত ঘুমের ওষুধের কারণে। কেবলমাত্র অবস্থা বেগতিক দেখলেই তারা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স বা বরিশাল শহরে নিয়ে যেতে বলে। এছাড়াও কবিরাজদের রমরমা ব্যবসা চলে এই ইউনিয়নে। কবিরাজদের দেয়া ওষুধ কোথা থেকে সংগ্রহ করে তারা, কেউ জানে না। এই ধরনের কবিরাজরা মাসে একবার আসে স্থানীয় বাজারে এবং ওই এক দিনেই তাদের যাবতীয় বিক্রি শেষ করে কয়েক মাসের জন্য উধাও হয়ে যায়। ছয় মাসের আগে একই কবিরাজ আর এই ইউনিয়নে আসে না, অন্য কেউ হয়তো আসবে এর মাঝে। এই লম্বা সময়ে মানুষ কবিরাজের কথাও ভুলে যায়। যথেষ্ট জ্ঞান না থাকায় কবিরাজদের পক্ষে প্রতারণা করা সহজ হয়। প্রকৃতপক্ষে বর্তমানে মেমানিয়ায় ভরসা করার মত তেমন কোন চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান নেই।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটি হচ্ছে মেমানিয়া ইউনিয়নবাসীদের একমাত্র ভরসার জায়গা, যদিও এটি পার্শ্ববর্তী বারাজালিয়া ইউনিয়নের খুন্নার বাজারে অবস্থিত। মেমানিয়া থেকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যেতে খেয়াঘাট থেকে এক ঘণ্টার পথ পাড়ি দিতে হয়। এই স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটিই হিজলা উপজেলার ৬টি ইউনিয়নের প্রায় দুই লাখ মানুষের চিকিৎসার ভরসা। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ৫ মিনিটে দূরত্বের পথ পরে রেমেডি নামক একটি বেসরকারি হাসপাতাল রয়েছে।

৬টি ইউনিয়নের মানুষের জন্য সরকারিভাবে এই স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটি সরকারি বরাদ্দ। এই হাসপাতালের সক্ষমতাও প্রশ্নবিদ্ধ। সাপে কাটার কোন চিকিৎসা নেই, নেই অপারেশন রুম; হাত-পা ভাঙারও কোন চিকিৎসা নেই। এমন সাধারণ অবস্থার চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই যেখানে, সেখানে ক্যান্সার, হেপাটাইটিস, ডায়াবেটিস, কিডনি রোগের চিকিৎসা এখানে হবে কল্পনাও করা যায় না।

৫.৩ মেমানিয়ার মানুষের চিকিৎসা গ্রহণের আগ্রহ

কোথা থেকে চিকিৎসা নিতে পছন্দ করে বা তাদের ভরসা কোথায় সেটা জানার জন্য জরীপ গবেষণা চালানো হয় মেমানিয়ার ১৬০টি পরিবারের ওপর।

প্রতিষ্ঠান	হাসপাতাল	ফার্মেসি	কবিরাজ
হার	৪১.৮৮%	৫৩.১২%	৫%

এই সমীক্ষা থেকে দেখা যায়, এলাকার ৪১.৮৮ শতাংশ মানুষ চিকিৎসা নিতে হাসপাতালে যায়, ৫৩.১২ শতাংশ মানুষ স্থানীয় বাজারের ফার্মেসিতেই চিকিৎসা করায় এবং বাকি ৫ শতাংশ কবিরাজের কাছ থেকে চিকিৎসা নিয়ে থাকে। এদের মধ্যে ১৩.৫৭ শতাংশ মানুষ দুটি জায়গা থেকে চিকিৎসা নিয়ে থাকে; ৩.৭৫ শতাংশ তিনটি জায়গা থেকেই চিকিৎসা নিচ্ছে বা নিয়েছে; বাকি ৮১.৮৮ শতাংশের দাবি, তারা সব সময় একটি জায়গা থেকেই চিকিৎসা নেয়। দুটি জায়গা থেকে চিকিৎসা নেয়া ১৩.৫৭ শতাংশের মধ্যে ৫৪.৫৫ শতাংশ হাসপাতাল ও ফার্মেসি থেকে চিকিৎসা নেয়; বাকি ৪৫.৪৫

উৎস	দুটি জায়গা থেকে চিকিৎসা গ্রহণ		একটি জায়গা থেকে চিকিৎসা গ্রহণ		
প্রতিষ্ঠান	হাসপাতাল এবং বাজারের ফার্মেসি	বাজারের ফার্মেসি এবং কবিরাজ	হাসপাতাল	বাজারের ফার্মেসি	কবিরাজ
হার	৫৪.৫৫%	৪৫.৪৫%	৪৩.৯৪%	৫৪.৫৫%	১.৫১%

শতাংশ স্থানীয় ফার্মেসি এবং কবিরাজ থেকে চিকিৎসা করায়। যারা শুধুমাত্র একটি জায়গা থেকে চিকিৎসা নিচ্ছে এমন ৮১.৮৮ শতাংশের মধ্যে ৪৩.৯৪ শতাংশ হাসপাতালের ওপর ভরসা করে, ৫৪.৫৫ শতাংশ বাজারের ফার্মাসিস্টের ওপর ভরসা করে এবং ১.৫১ শতাংশ কেবলই কবিরাজ থেকে চিকিৎসা করায়।

ওপরের তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে, মেমানিয়া ইউনিয়নের প্রায় ৫৮.১২ শতাংশ মানুষই ব্যাপক স্বাস্থ্যঝুঁকিতে রয়েছে।

৫.৪ কাছাকাছি হাসপাতালের অবস্থা

সবচেয়ে কাছের হাসপাতালটি হচ্ছে হিজলা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স। এটি ৩১ শয্যা হাসপাতাল। সরকারি ডাক্তার ও নার্স থাকার কথা এখানে; তবে তাদের উপস্থিতিও তেমন একটা চোখে পড়ে না। ৬টি ইউনিয়নের মানুষের জন্য সরকারিভাবে এই স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটি সরকারি বরাদ্দ। এই হাসপাতালের সক্ষমতাও প্রশ্নবিদ্ধ। সাপে কাটার কোন চিকিৎসা নেই, নেই অপারেশন রুম; হাত-পা ভাঙারও কোন চিকিৎসা নেই। এমন সাধারণ অবস্থার চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই যেখানে, সেখানে ক্যান্সার, হেপাটাইটিস, ডায়াবেটিস, কিডনি রোগের চিকিৎসা এখানে হবে কল্পনাও করা যায় না। অথচ গবেষণায় এসব রোগে মেমানিয়ার মানুষের আক্রান্তের তথ্য পাওয়া গেছে। প্রসূতিদের পরিচর্যার ব্যবস্থাও নেই এই স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে। শুধুমাত্র জ্বর, ডায়রিয়া, সর্দি, বমি ইত্যাদির হালকা চিকিৎসা পাওয়া যায়, এর বাইরের সকল রোগেই বরিশাল শহরে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেয়া হয়।

বেসরকারি হাসপাতাল রেমিডির চিকিৎসাব্যবস্থা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে ভাল। নিয়মিত ডাক্তার ও সেবিকা রয়েছে। জটিল রোগ ব্যতীত মোটামুটি রোগের চিকিৎসা করার মত সামর্থ্য রয়েছে রেমিডিতে। কিন্তু বেসরকারি হাসপাতাল হওয়ার দরুন খরচ তুলনামূলক বেশ এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উপজেলাবাসীর আয়সীমার বাইরে। (চলবে)

মোঃ শফিকুল ইসলাম : স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থী, অর্থনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
ই-মেইল : shafiqi.mohsin@gmail.com